The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL. XXXIX (Issue 1), 2023 (pp.123 -132)
Published in October, 2025

স্বদেশী আন্দোলন ও সরলা দেবী চৌধুরাণী: একটি অনুসন্ধান

সৈয়দ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম *

প্রতিপাদ্যসার: সরলা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫ খ্রি.) ছিলেন বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত এবং ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। তিনি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা স্বদেশী আন্দোলন-এর ক্ষেত্র তৈরি ও সৃষ্টিতে অসাধারণ কৃতিত্ব স্থাপন করেন। অসীম সাহসী সরলা দেবী চৌধুরাণী ছিলেন বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী প্রথম নারী। ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু নারী অংশগ্রহণ করলেও উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে যে সমস্ত নারী সর্বপ্রথম আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে আসেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন সরলা দেবী। বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী, বিচিত্র কর্মযজ্ঞে নিবেদিত এই নারী শৈশব থেকে তাঁর স্বাজাত্যবোধ, সঙ্গীত সাধনা, সাহিত্যকর্মে নৈপুণ্য, সর্বোপরি স্বদেশী ভাবধারার প্রসার ও বাঙালির জাতীয়তাবাদের উন্মেষে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং লেখনীর মাধ্যমে ভারতের মেয়েদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার গুরুদায়িত্ব পালন করেন। জাতীয়তাবাদী এই নারীকে বাংলার *জোয়ান অব আর্ক* নামে অভিহিত করা হয়। বিশ শতকের বাংলার নারী জাগরণে তাঁর রয়েছে ঐতিহাসিক ভূমিকা। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তিনি উপেক্ষিতই থেকে গেছেন। বাংলার অধিকাংশ মানুষ স্বদেশী ভাবধারার পথিকৃত এই বীরাঙ্গনা নারীর কথা জানে না। তাই নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন তুলে ধরা প্রয়োজন। আলোচ্য প্রবন্ধে এ সরলা দেবী চৌধুরাণীর কর্মময় জীবন এবং সমকালীন রাজনীতি ও সমাজে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।]

ভূমিকা

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের সূচনাপর্ব জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের কাল হিসেবে চিহ্নিত। এই জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের প্রেক্ষাপটে একদিকে ছিলো বিদেশী শাসন-শোষণ-বঞ্চনা, অন্যদিকে ছিল দেশাত্মবোধক সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্র সম্পাদনার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ জনমত গঠন। সর্বোপরি দেশ ও জাতির প্রয়োজনে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। এ সময় ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাঙালি নারীকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে অনুপ্রাণিত করে এবং নারীসমাজ ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ হতে ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। ১৮৮৩ সালে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সর্বপ্রথম নারীরা অংশগ্রহণ করে (বেগম ১০০)। ১৮৮৫ সালে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় কংগ্রেস' গঠিত হলে স্বর্ণকুমারী দেবী ও কাদম্বিনী দেবী এ সংগঠনে যোগদান করেন। ১৮৮৯ সালে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের অধিবেশনে দশজন মহিলা ডেলিগেট অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, পণ্ডিত রামাবাঈ, শেবন্তীবাঈ ত্রিম্বক, শান্তাবাঈ নিকাম্বো, কাশীবাঈ কানিতকর, মানেকজী, কারমেতজী প্রমুখ (Mukherjee 44)। উল্লেখ যে, ১৯০১ সালে All India National Congress এর অধিবেশনে ২০০ জন নারী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন (বেগম ও হক ৯৬)। বাংলার ইতিহাসে জাতীয় আন্দোলনে নারীর সরাসরি অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন একটি মাইলফলক। এ আন্দোলনে ব্যাপক সংখ্যক বাঙালি নারী পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাইরে গিয়ে মুক্তি আন্দোলনে

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

শামিল হয় এবং জাতীয় দুর্যোগে এগিয়ে আসে। পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে তাঁরা রাজনৈতিক সচেতনতা ও বলিষ্ঠতার প্রমাণ দেয়। বিশ শতকের প্রথমদিকে পরাধীন ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার মন্ত্র নিয়ে যেসব রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ নারী স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সরলা দেবী চৌধুরাণী। তিনি জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত নারী দেশকর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও স্বতন্ত্রতায় উজ্জ্বল ছিলেন। বিশেষ করে এদেশে নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরনীয়। তাঁর লেখায়, বক্তৃতায় ও কার্যক্রমে নারী জাতির সম্মুখে এক দীপ্ত আদর্শরূপে ফুটে উঠেছে এবং সে আদর্শ অনুসরণ করে বাংলার কিশোরী, যুবতী, এমনকি প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধরা পর্যন্ত জেগে উঠেছেন। বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী এই তেজস্বিনী নারী দেশবাসীকে স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সারাজীবন কাজ করেছেন। বিচিত্র ছিল তাঁর জীবন। নারীমুক্তিবাদী ঐতিহাসিকদের মতে, নারী মানবজাতির অর্ধেক হলেও প্রচলিত ইতিহাস রচনায় তারা সর্বদা অবহেলিত। আমরা এমনই এক নারী, সরলা দেবী চৌধুরাণীর ভূমিকা আলোচনা করবো যিনি ইতিহাসে অনালোকিত থেকে গেছেন। এই প্রবন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যেখানে স্বদেশী আন্দোলনের সময় আলোচিত পত্র-পত্রিকা, সরকারি দলিল দস্তাবেজ প্রাথমিক উৎস হিসেবে এবং বিষয়সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

পরিচয়:

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজসেবিকা সরলা দেবী চৌধুরাণী মামাবাড়ি জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে ১৮৭২ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সাহিত্যিক স্বর্ণকুমারী দেবী এবং বাবা নদীয়ার জয়রামপুরের জমিদার, জানকীনাথ ঘোষালও ছিলেন স্বাধীন ও মুক্ত মনের মানুষ। জানকীনাথ ঘোষাল ব্যারএট. ল. পাস করে এসে অন্যান্য জামাতার মতো শ্বশুরবাড়িতে না থেকে আলাদাভাবে থাকতেন পরিবার নিয়ে। তিনি কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বেঙ্গল কংগ্রেসের সেক্রেটারি ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। মোহনদাস করমচাদ গান্ধী মহাত্মা হবার আগে তাঁর প্রাথমিক কলকাতা আবাসপর্বের ঠিকানা ছিল ঘোষাল বাড়ি।

পিতার প্রবাসকালে সরলা দেবীর শৈশব কাটে জোড়াসাঁকোয় মামাবাড়িতে। সেখানে তিনি এক উৎকৃষ্ট সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিবেশে বড় হন। মামা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সব সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু। সরলা দেবীর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বেথুন স্কুলে। সেখান থেকে তিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে ১৮৮৬ সালে এন্ট্রান্স, বেথুন কলেজ থেকে ১৮৮৮ সালে এফ. এ. এবং ইংরেজিতে অনার্সসহ বি. এ. পাশ করেন ১৮৯০ সালে। বি. এ. পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে তিনি পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ করেন (সেনগুপ্ত ২৮১)। তিনি সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায়ও দক্ষ ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল এবং তিনি শতাধিক স্বদেশমূলক গান রচনা করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করার পর কর্মজীবনে সরলা দেবী মহীশুরের মহারাণী গার্লস স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম বাড়ির বাইরে গিয়ে চাকরি করেন। এক বছর পর তিনি আবার কলকাতায় ফিরে আসেন এবং *ভারতী*[১] পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন এবং এ সময় থেকে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন (সুলতানা ৩)। তিনি একসময় পত্রিকাটি সম্পাদনাও করেন। তাঁর সময়ে পত্রিকাটিতে নতুন একটি বিভাগ সংযোজিত হয় 'খেয়াল খাতা' নামে। স্বদেশী ভাবধারার রচনা এ বিভাগটিতে স্থান পেত। জাতীয় উন্নতি সাধনের চেষ্টায় ঠাকুরবাড়ির মহিলারা পুরুষদের সাথে সমানতালে এগিয়ে চলছিল। স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর অবস্থান সম্পর্কে নারীসমাজকে সচেতন করতে না পারলে আন্দোলন সাফল্য লাভ করতে পারেনা, এ বিচারবোধের সঙ্গে অসামান্য এক তেজস্বিতার সমন্বয় ঘটেছিল সরলা দেবীর মধ্যে (ভট্টাচার্য ৫১৩)। তাঁর অনুপ্রেরণায় এরপরে আরও অনেক মহিলা এই আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি মনে করতেন একমাত্র আগ্রাসন এবং অস্ত্রের দ্বারাই ব্রিটিশ শাসন

নির্মূল করা সম্ভব। যে যুগে ষোল বছর পূর্ণ হবার আগেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়, সেই যুগে সরলা দেবী তেত্রিশ বছর (১৯০৫) বয়সে নিজের পছন্দেই বিয়ে করেন পাঞ্জাবের হিন্দুস্তান পত্রিকার সম্পাদক, বিশিষ্ট আইনজীবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী রামভজ দত্ত চৌধুরীকে। এটি ছিলো আন্তঃপ্রাদেশিক বিয়ে। তিনি বিয়ের পরে পাঞ্জাবে গিয়েও নিজেকে স্বদেশী আন্দোলনে মেলে ধরেন (বেগম ১০৩)।

স্বদেশী ভাবধারার বিকাশে অবদান

উনিশ শতকের আশির দশক থেকে বাংলায় শিক্ষিত নারীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা কিছু মাত্রায় সঞ্চারিত হতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ-পূর্ব ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ পর্বে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটে সরলা দেবীর মধ্যে। আশৈশব সরলা বড় হয়েছেন স্বতন্ত্রভাবে। তাঁর চিন্তার জগৎ ছিল স্বাধীন ও স্বচ্ছ। ছোটবেলা থেকে তাঁর মধ্যে ছিল প্রখর আত্মসম্মানবোধ। তিনি গর্বিত ছিলেন বাঙালি পরিচয়ে। মেকলের রচিত সেসময়ের স্কুল পাঠ্য *ক্লাইভের বঙ্গবিজয় গ্রন্থে* বাঙালি চরিত্রকে হেয় করে দেখানো হয়। এ গ্রন্থ থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হলে সরলা দেবী বাঙালিকে হেয় করার প্রতিবাদ করেন উত্তরপত্রে। মেকলের বাঙালি চরিত্র বর্ণনায় যে অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছিল, তা তুলে ধরে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এ ব্যাপারে তার বিপরীত মতামত সুন্দর যুক্তি ও তথ্য দিয়ে সাজিয়ে উত্তর লিখেছেন। এভাবেই কিশোরী বয়সেই স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন সরলা দেবী। কিশোরী অবস্থায় ইলবার্ট বিল আন্দোলনে (১৮৮৩ খ্রি.) যোগ দেয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে। সরলা দেবীর মা, স্বর্ণকুমারী দেবী জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং হিন্দুমেলায় যোগ দিয়ে মেয়েদের মধ্যে স্বদেশীয়ানার সূচনা করেছেন। এই উত্তরাধিকার সরলা দেবীকে রাজনৈতিক দীক্ষা দান করে। সরলা দেবী বরং মায়ের চেয়ে অনেক বেশি রাজনীতি সচেতন হয়েছেন (মুরশিদ ২৬৩)। ১৯০১ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের মঞ্চে তাঁর প্রথম রাজনৈতিক উপস্থিতি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সম্ভবত তিনিই প্রথম মহিলা যিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন (সেনগুপ্ত ৭৬৪)। ১৮৯৫ সাল থেকে *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখাগুলো যুবমানসকে বীর্যমন্ত্রে দীক্ষিত করে। *ভারতী* পত্রিকার মূলমন্ত্রই ছিলো দেশবাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। যুবসমাজকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে *ভারতী*তে লিখলেন *আহিতাগ্নিকা* কবিতা। এই কবিতার কয়েকটি লাইন হচ্ছে-

সর্বদেব সাক্ষী করি একি ব্রত করিলে গ্রহণ!
পথ যে দুর্গম একায়ন!
সুতীব্র দিবস আর সুদীর্ঘ শর্বরী,
অপ্রকম্পচিত্তে
সর্ব ভয় পরিহরি
পারিবে কি যেতে?
হে সুখলালিতা! (দেবী ১৪৫)

এই লেখনী সারা দেশের যুবমানসে স্বাদেশিকতার ঝড় বইয়ে দেয়। তিনি বাঙালির মুমূর্ষু আত্মসম্মানকে জাগানোর পুণ্যকর্মে ব্রতী হলেন। উনিশ শতক থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় একটি আক্ষেপ বার বার শোনা যেতো-বাঙালি যথেষ্ঠ শারীরিকভাবে সবল নয় (বসু ৭৯)। এই প্রেক্ষাপটে তিনি এক 'আখরার সংস্কৃতি'র[২] সৃষ্টি করেন এবং যুবকদের শারীরিক প্রশিক্ষণে উৎসাহিত করে এক জাতীয়তাবোধ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, শুধু

শারীরিক দুর্বলতা দূর করলে হবে না, বাঙালির মন থেকে ভীরুতা অপসারণ করতে হবে। দেখা যায় পশ্চিম ও পাঞ্জাবের বড় বড় পালোয়ানরাও সাহেব-ভীতিতে ভরা। এই সাদা চামড়া ভীতি দূর করার লক্ষ্যে সচেষ্ট ছিলেন সরলা দেবী। তিনি *ভারতী* পত্রিকায় মৃত্যুচর্চা, ব্যায়ামচর্চা, 'বিলেতি ঘুষি বনাম দেশি কিল' প্রভৃতি প্রবন্ধে বাঙালি জাতিকে সুস্থ-সবল হতে এবং বিদেশীদের অপমানের আমৃত্যু প্রতিবাদ করার আহবান জানান (চৌধুরী ৫২৬)। কংগ্রেসের নরমপন্থায় বিশ্বাস না করে, তিনি মনে করেন, সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন সময়ের দাবী। তাই তিনি লিখলেন-"মৃত্যুকে যেচে বরণ করতে শিখো, অগত্যা তার কবলিত হয়ো না। তাকে স্পর্ধা করো, তার সম্মুখীন হও। মানুষের বড় পুঁজি-সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীর" (দেবী ১২৬)। সরলা দেবী 'বিলেতি ঘুষি বনাম দেশি কিল' প্রবন্ধে ভারতবাসীর বীরত্ব, সাহসিকতা ও আত্মসম্মানবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রকাশ করতে শুরু করেন। এতে প্রকাশিত হতে থাকলো-"রেলে, স্টিমারে, পথেঘাটে যেখানে যেখানে গোরা সৈনিক বা সিভিলিয়ানদের হাতে স্ত্রী, ভগিনী, কন্যারা অপমানিত হতো, তারা কিভাবে নিজের অপমানে আদালতের আশ্রয় না নিয়ে, নিজ হাতে অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে-সেই সকল ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক বর্ণনা" (দেবী ১২৬)। এ সমস্ত বর্ণনা পাঠ করে দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেমের আগুন জ্বলে ওঠে প্রবল তেজে। এর ফলে স্কুল কলেজের ছাত্ররা দলে দলে সরলা দেবীর সাথে কাছে আসে স্বদেশপ্রেমের নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হতে। সরলা দেবী এদের মধ্যে থেকে বাছাই করা ছেলেদের নিয়ে একটি *অন্তরঙ্গ* দল গঠন করলেন। এ দলের সদস্যরা ভারতের মানচিত্রে প্রণাম করে হাতে লালসুতো বেঁধে শপথ করে বলতেন তারা 'তনু, মন, ধন' দিয়ে ভারতের সেবা করবেন। সরলা দেবী প্রচলিত এই লালসুতো বছর কয়েক পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশময় ছড়ালো মৈত্রীর সূচকরূপে (বেগম ১০৩)। সরলা নিজ বাড়িতে এই তরুণদের জন্য ব্যায়াম ও কুস্তি শেখাবার কেন্দ্র স্থাপন করে। তাছাড়া এখানে সাঁতার খেলা, লাঠি খেলা, ঘোড়ায় চড়া, মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা, সাইকেলে চড়া ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। একই সঙ্গে ছেলেদের গ্যারিবল্ডি, ম্যাতসিনির জীবনী এবং অন্যান্য বৈপ্লবিক আন্দোলন কিভাবে পরিচালিত হয়েছিল সে বিষয়ে বক্তৃতা দেয়া হত (মুখোপাধ্যায় ১১৯)।

কেউ কেউ মনে করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ত সরলা দেবীকে উপলক্ষ্য করেই রচনা করছেন *চার অধ্যায়*, যেখানে একটি মেয়ে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলামোচনে শতসহস্র যুবককে দীক্ষিত করেছেন জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে। এরকম ঘটনা তৎকালীন বাংলা বা ভারত নয় বিশ্ব ইতিহাসেও বিরল (দেব ৯০)। সরলা দেবী চেয়েছেন যুব শক্তিকে জাগ্রত করে তাদের মধ্যে শক্তি ও সাহসের সঞ্চার করতে। উল্লেখ যে, সরলা দেবী ১৯০০ সালে বারীন্দ্রনাথ ঘোষের সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করেন *ভারত উদ্ধার দল*। এখানেও বাঙালি যুবক ও যুবতীদেরকে লাঠিখেলা, তলোয়ার চালানো, কুস্তি লড়াই এবং শরীরচর্চার নানা কৌশল শেখানো হত। ঢাকার অনুশীলন সমিতির সদস্য ও ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতির সদস্যরা এখানে আসত অংশগ্রহণ করার জন্য। এখানে স্মরণযোগ্য যে, উনিশ শতকের শেষভাগেও স্পষ্ট রাজনীতিবোধ দানা বেঁধে ওঠেনি। দেশপ্রেম বা স্বদেশ অনুরাগ তখন জনকল্যাণ, দেশহিত, স্বদেশের লুপ্ত গরিমা পুনরুদ্ধার ইত্যাদি ধারণার সাথে সমার্থক (বন্দোপাধ্যায় ১২)।

সরলা দেবী সংগীতের মাধ্যমে দেশপ্রেমের মন্ত্রে নারী-পুরুষকে উজ্জীবিত করতে পেরেছেন। সুরের সাধনাক্ষেত্রে সরলা দেবী ছিলেন সার্থক গায়িকা। গান রচনা ও সুর যোজনায় তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গানের সুর তৈরিতে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য (পাত্র ৮১)। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীত, যন্ত্র সংগীতসহ সংগীতের অধিকাংশ বিভাগে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। চৌদ্দ বছরের কম বয়স থেকে সরলা দেবী মায়ের উৎসাহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, পার্টিতে গান গাইতেন (চট্টোপাধ্যায় ১০৩)। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বন্দে মাতরম' গানটিতে সুর দিয়ে নিজে গেয়ে শুনিয়েছেন,

সঙ্গে অর্গান বাজিয়েছেন সরলা দেবী (বন্দোপাধ্যায় ৩৩)। এরপর সরলা দেবী ১৯০১ সালের ২৪ই ডিসেম্বর কলকাতার একটি জাতীয় প্রদর্শনশালার উদ্বোধনে অতুল প্রসাদের 'ওঠ গো ভারত লক্ষ্মী' গানটি গেয়ে সাড়া ফেলে দেন। ঠিক তার কয়েকদিন পর জাতীয় কংগ্রেস-এর কলকাতা অধিবেশনে তাঁর রচিত ও গাওয়া 'নমো হিন্দুস্তান' গানটি দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনা সৃষ্টি করে (Roy 2)। গানটি ছিল সেকালের শ্রেষ্ঠ স্বদেশী সংগীত। অনেকটা 'বন্দে মাতরম'-এর ছায়া এর ওপরে প্রতিফলিত (পালিত ৭৪০)। *এটি ভারতী* পত্রিকায় মাঘ, ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই জনপ্রিয় গানের কয়েকটি লাইন-

গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে
নমো হিন্দুস্থান।
হর হর হর-জয় হিন্দুস্থান
সৎশ্রী আকাল হিন্দুস্থান,
আল্লা হো আকবর হিন্দুস্থান!
নমো হিন্দুস্থান! (দেবী ১৩৩)

এ গানটি ছিলো সর্বভারতীয় সংগীত। কারণ কংগ্রেসের অধিবেশনে বাংলা, বিহার, আসাম, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, গুজরাটসহ ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের হিন্দু, পার্সি, শিখ, জৈন, খ্রিস্টান ও মুসলমানসহ সকল ধর্মের ৫৬ জন গায়ক একসাথে গানটি গেয়েছেন (গঙ্গোপাধ্যায় ৯৭)। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের গান ছাড়া আর কোনো বাঙালির গান সর্বভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা সমবেত কণ্ঠে জাতীয় কংগ্রেসে গীত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' গানটির পূর্বাবাস এতে সুস্পষ্ট। বেনারসে ১৯০৫ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি গোখলের অনুরোধে সরলা দেবী, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' গানটিতে সুর দেন (Nayyar 158)। গানটিতে সরলার গায়কী এবং সুর বিপ্লবীদের স্বাধীনতাস্পৃহা আরো বাড়িয়ে দেয়। তিনি তাঁর কণ্ঠের সকল মধু ঢেলে গানটি গেয়েছেন এবং তাতে ভারতের দেশ-দেশান্তর থেকে সমাগত স্বদেশভক্তগণ মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা মিসেস সোভিয়ার সরলার গানে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন-"আর কিছু না শুধু যদি জাতীয় গান গেয়ে ফেরো তুমি ভারতের নগরে গ্রামে গ্রামে, সমস্ত দেশকে জাগাতে পারবে" (চট্টোপাধ্যায় ১০৩)। সরলা দেবীর দেয়া সুরেই এ 'বন্দে মাতরম' গানটি পরবর্তীতে সভা-সমিতিতে গাওয়া হতে লাগলো। এরপর তিনি বহু স্বদেশী গান রচনা করেন যে গুলি দেশবাসীর মনে চরম উন্মাদনা সৃষ্টি করে। তাঁর অপর একটি গানের কয়েকটি লাইন-

বন্দি তোমায় ভারত জননী, বিদ্যা মুকুট ধারিণী
বরপুত্রের তপঃঅর্জিত গৌরব মণিমালিনী। (সেন ৪৮)

বাঙালির মধ্যে স্বদেশ গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য সরলা দেবী *প্রতাপাদিত্য উৎসব*, *উদয়াদিত্য উৎসব* এবং *বীরাষ্টমী ব্রত* উৎসবের প্রচলন করেন। তিনি জাতীয়তাবাদের উন্মেষের জন্য পৌরুষের বীররূপ আরাধানা করেছেন এসব উৎসবের মাধ্যমে (দেব ১০১)। তিনি প্রথমে ১৯০৩ সালে মহারাষ্ট্রের *শিবাজী উৎসবের*[৩] আদলে বাংলায় *প্রতাপাদিত্য উৎসব*[৪] চালু করেন এবং একই বছর চালু করেন প্রতাপাদিত্যের ছেলে উদয়াদিত্যের নামে *উদয়াদিত্য উৎসব*। এই উৎসবের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে সরলা দেবীর বক্তব্য ছিলো-

> রাজপুত বীরবালক বাদল প্রভৃতির কীর্তি পড়ে আমরা বাঙালিরা অভিভূত হই, তাদের গৌরবে গৌরবানুভব করি, কবিতা বানাই, কিন্তু বাঙালির ঘরের ছেলে উদয়াদিত্য যে মোগলদের বিরুদ্ধে বাঙালির স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টায়-সমরে দেহপাত করেছিলেন-তার খবর কিছুই রাখিনে। তাঁর স্মৃতি বাঙালি যুবকের ধমনিতে ধমনিতে প্রবাহিত করে দেওয়া দরকার (দেবী ১২১-১২২)।

এ উৎসবের মধ্য দিয়ে তিনি বঙ্গভঙ্গের পূর্বে বাঙালি তরুণদের স্বদেশী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। এ সময় (১৯০৩ খ্রি.) কলকাতায় প্রকাশ্যে সভানেতৃত্বের আহবান আসে সরলা দেবীর কাছে। প্রকাশ্যে জনসভায় নেতৃত্বদানের ব্যাপারে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে প্রথমদিকে দ্বিধা থাকলেও পরে তিনি রাজি হন। তাঁর নির্দেশিত তারিখে (১লা বৈশাখ) যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেকের দিনে *প্রতাপাদিত্য উৎসব* পালিত হয় (সেন ৮)। প্রতাপাদিত্যের জীবনী পাঠ, লাঠি খেলা, কুস্তি, বক্সিং প্রভৃতি শারীরিক কসরত প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সরলা দেবী প্রতিযোগীদের মেডেল বিতরণ করেন। সেই মেডেলের একদিকে খোদাই ছিল-*দেবাঃ দুর্বলঘাতকা*। তৎকালীন সমাজ প্রকাশ্য সভায় নারীর নেতৃত্বদানে সরলা দেবীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। গৃহকোণের বাইরের জগতে একক নারীর এ স্বচ্ছন্দ বিচরণ ও নেতৃত্বদানে প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে সেসময়কার পত্র-পত্রিকাগুলি (সেন: ২০০৪, ১২৮)। সরলা দেবীর তেজস্বিতা, সাহসিকতা, শাসকদলের বিরুদ্ধে নেতৃত্বদানের ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে *বঙ্গবাসী* পত্রিকা তাঁকে দশভুজা দুর্গার সাথে তুলনা করেন। পত্রিকাটি লিখেছে-

> মরি মরি কি দেখিলাম! এ কি সভা! বক্তিমে নয়, টেবিল চাপড়া-চাপড়ি নয়–শুধু বঙ্গবীরের স্মৃতি আবাহন, বঙ্গ-যুবকদের কঠিন হস্তে অস্ত্রধারণ ও তাদের নেত্রী এক বঙ্গ ললনা-ব্রাহ্মণকুমারীর সুকোমল হস্তে পুরষ্কার বিতরণ। দেবী দশভুজা কি আজ সশরীরে অবতীর্ণা হইলেন। ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যা জাগিয়েছে, বঙ্গের গৌরবের দিন ফিরিয়াছে (চৌধুরী ৫২৭)।

যদিও এ উৎসবকে ঘিরে মামা রবীন্দ্রনাথের সাথে সরলা দেবীর মতবিরোধ হয়। প্রতাপাদিত্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব না থাকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জাতীয় বীর মানতে নারাজ। অন্যদিকে সরলা শুধুমাত্র প্রতাপাদিত্যের সাহসিকতা ও মোগল সুবাহ্‌দারদের বিরুদ্ধে লড়ার মনোভাব দেখে তাঁকে বীর বলে আখ্যা দেন। স্বাধীনতাপ্রিয় এ জমিদারকে তিনি জাতীয় স্তরে নিয়ে যান এবং তাঁর নামে উৎসব প্রচলন করেন (দেব ১০১)। ১৯০৪ সালে সরলা দেবী বাঙালিকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য প্রচলন করলেন *বীরাষ্টমী ব্রতের*। দুর্গাপুজার সময় মহাষ্টমীর দিন তরুণেরা তলোয়ারকে ফুল এবং চন্দন দিয়ে সজ্জিত করে ভারতের সকল বীরের নামে স্তোত্র পাঠ করে অঞ্জলি দিত, মায়েরা শক্তিমন্ত্রের চিহ্নস্বরূপ নিজের সন্তানের হাতে রাখি বেঁধে দিতেন। নানান ধরনের আয়োজনও করা হত এই দিনে। এ উপলক্ষে সরলা দেবী বীরাষ্টমী গানও রচনা করেন। বীরাষ্টমী গানের প্রতিটি চরণে বলিষ্ঠ স্বদেশ প্রেমের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, যেমন-

> স্বদেশানুরাগে যেই জন জাগে, অতি মহাপাপী হোক না কেনো
> তবুও সে জন অতি মহাজন সার্থক জনম তাহার জেনো (গঙ্গোপাধ্যায় ৯৭)।

সরলা দেবী *বঙের বীর* সিরিজের কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করে বাঙালিদের মনে জাতীয়তাবাদ চেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা চালাতেন (দাশগুপ্ত ৩২)। সরলা দেবী কর্তৃক প্রচলিত এ সকল অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের তুলনায় বাঙালি জাতির শারীরিক এবং মানসিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ

করেছেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সরলা দেবী বাংলার স্বাধীনতার জন্য প্রতাপাদিত্যকে বীরপুজার উপযুক্ত মনে করলেন, এমন আরো অনেককেই মনে করলেন কিন্তু যে মুসলমান শাসকদের হাতে বাংলা স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল, তাঁদের কারো কোনো নামে বীরপূজার আয়োজন করেননি। এমনকি তাঁর লিখিত *বঙ্গের বীর* সিরিজেও বাংলার এই স্বাধীন শাসকদের বঙ্গের বীরের মর্যাদা দেননি সরলা দেবী। তাছাড়া যখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছিল, তখন তাঁর এই কাজগুলোতে হিন্দুত্বের একটা মনোভাব প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায় (মুরশিদ ২৬৩)।

স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার পূর্বে থেকেই দেশীয় পণ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন 'স্বদেশী ভাণ্ডার' খোলা হতে থাকে। এসময় আপামর জনসাধারণ মেতে ওঠে স্বাদেশিকতায়। মেয়েরাও এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। স্বদেশ সেবায় এগিয়ে আসা মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ছিলো মধ্যবিত্ত পরিবার। সরলা দেবী স্বদেশী জিনিস ব্যবহার ও প্রচারের জন্য নিজ খরচে ১৯০৩ সালে কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠা করেন 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করা জিনিস বিক্রি করা হত শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য (Roy 2)। ১৯০৪ সালে বম্বে কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে এ 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' থেকে বিভিন্ন দেশীয় পণ্য প্রেরণ করা হয় এবং প্রদর্শনীতে সরলা দেবী স্বর্ণপদক লাভ করেন। এ মেডেলটি তিনি শাড়ীর ব্রোচ হিসেবে ব্যবহার করতেন সবসময়। সরলা দেবী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন মিলে কলকাতার বউ বাজারে *Swadeshi Stores* নামে আরেকটি স্বদেশী জিনিসের দোকান পরিচালনা করেন। এ প্রসঙ্গে সরলা দেবী লিখেছেন-"আমার ও যোগেশ বাবুর স্বদেশী প্রচেষ্টা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বহু পূর্বে শুরু হয়েছিলো" (দাশগুপ্ত ৩৩)। ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী সমাজের আগেই তিনি তাঁর স্বদেশী ভাবনা প্রকাশ ও রূপায়িত করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি স্বদেশী পালা-পার্বনগুলোকে সাহেবি রূপ দিয়ে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন। স্বদেশী জিনিসের প্রচারের জন্য তিনি মেয়েদের মধ্যে আলতা ও টিপ-এর ব্যবহার প্রচলন করেন (দেব ১০২)। উল্লেখ্য কোন উৎসবে যেতে হলে সরলা দেবী আপাদমস্তক স্বদেশী পোশাকে সজ্জিত থাকতেন। সরলা দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন-"যে জাতির ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কৃষিকার্য বিদেশীকৃত আইনের শাসনের দ্বারাই বিদেশীদের হস্তগত সে জাতি কখনোই স্বাধীনতার গৌরবে গৌরবান্বিত হতে পারে না" (দেবী ১৫৪)।

সরলা দেবীর রাজনৈতিক জীবনের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল *ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতি* (১৯০০)। এ সমিতির তিনি শুধু পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না, ছিলেন অন্যতম কর্ণধারও। এমনকি বৈবাহিক সুত্রে তিনি পাঞ্জাববাসী হলেও তিনি এ সমিতির সাথে ওঁতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এ সমিতির নেতা কেদারনাথ চক্রবর্তী ও ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলির সাথে পত্রযোগে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। এটি শুরুতে রাজনৈতিক সংগঠনটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি। এটি ছিলো মূলত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। স্বদেশী পণ্যের প্রসার এবং সদস্যেদের নৈতিক মনোবল বৃদ্ধির জন্য কাজ করত সংগঠনটি। *অল ইন্ডিয়া ভলেনটিয়ার্স লীগের* সম্মেলনে (১৯০৫) যোগদানের জন্য সরলা দেবী ময়মনসিংহে আসেন। তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে তাঁরই উৎসাহে ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতি, 'বীরাষ্টমী' ও 'প্রতাপাদিত্য' উৎসব পালন করে। তিনি এ উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। সরলা দেবীর আগমনের পর থেকেই সংগঠনটি রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। এ উৎসবে সমিতির ছেলেরা 'আনন্দ-মঠ' অভিনয় করে এবং তারাই প্রথম 'বন্দে মাতরম'কে জাতীয় ধ্বনি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল (খাতুন ১১৬)। সরলা দেবীকে তারা 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়ে অভিবাদন জানিয়েছিল। সেই থেকে এ ধ্বনি সারা ভারতবর্ষে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সরলা দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন-

> "বন্দে মাতরম" শব্দটি মন্ত্র হল সর্বপ্রথম যখন মৈমনসিংহের সুহৃদ সমিতি আমাকে স্টেশন থেকে তাদের সভায় প্রসেশন করে নিয়ে যাবার সময় ঐ শব্দ দুট হুংকার করে যেতে থাকল। সেই থেকে সারা বাঙলায় এবং ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ঐ মন্ত্রটি ছড়িয়ে পড়ল- বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে যখন গর্বনর সাহেবের অত্যাচার আরম্ভ হল আহিমালয়-কুমারিকা পর্যন্ত ঐ বোলটি ধরে নিলে (দেবী ৪৮)।

সভায় সরলা দেবী যে বক্তব্যটি দিয়েছেন তার মূল কথা ছিল দেশকে, দেশের কাজকে একান্তে আপন করে ভাবার আহবান এবং নিজের দেশের জল-মাটির সঙ্গে দেশের মানুষের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি নিজের দ্বারা উৎপাদিত হলে তবেই তাকে নিজেদের জিনিস বলা যাবে-সেইভাবে উৎপাদন করা গেলে তবেই দেশকে যথার্থ সভ্য দেশ বলে প্রমাণ করা যাবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এ ভাষণের পরে সমিতির সদস্যদের মধ্যে একটা সর্বভারতীয় জাতীয় জীবনবোধ বা চেতনা বঙ্গভঙ্গের আগেই তৈরি হয়েছিল। এ সমিতি ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইংরেজ উৎপাদিত দ্রব্য বয়কট এবং স্বদেশী পণ্যের প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল। পরবর্তীতে সরলা দেবী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও বিপিনচন্দ্র পালের সাথে *Bengal Party* (১৯০৫) নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন (Samanta 808)।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সময় সরলা দেবীর জীবনে পটপরিবর্তন ঘটে। এই সময় তিনি বিবাহসুত্রে পাঞ্জাবে বসবাস শুরু করেন। পাঞ্জাবে থেকেও তিনি বাংলার স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে থাকেননি। দূরে থাকা সম্ভবও ছিল না। কারণ বাংলায় তিনিই এ আন্দোলনের ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। নিজের সঙ্গে এ আন্দোলনের বীজমন্ত্রকে অন্যপ্রদেশে নিয়ে গিয়ে সেখানেও প্রোথিত করেছেন। সরলা দেবীর জন্য সেটা সহজ হয়েছিল কারণ স্বামী রামভুজ দত্ত তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গী হয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে তিনি সেখানে জাতীয় আন্দোলনে অংশ নিয়ে সমগ্র ভারত জুড়ে এক নব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র তখন সমস্ত বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশে বিস্তৃতি লাভ করেছিল (চট্টোপাধ্যায় ১১৩)। সরলা দেবীর মধ্য দিয়েই বাংলার স্বদেশী আন্দোলন সর্বভারতীয় চরিত্র লাভ করে। নিজের বাড়িতে সভা করে পাঞ্জাবে বসবাসকারী বাঙালি মহিলাদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন *The Society of Practical Nationalism*। সেখানে কবিতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হত। সেই প্রতিযোগিতায় কবিতার বিষয়বস্তু ছিল দেশপ্রেম আর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল হিন্দু-মুসলমান ইউনিয়ন। পরবর্তীতে ১৯১০ সালে সরলা দেবী *ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল* নামে একটি নারী কল্যাণমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা এতে অংশগ্রহণ করে। এ সংগঠনটি ক্রমে দিল্লি, করাচি, হায়দারাবাদ প্রভৃতি শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এ সংগঠনের মাধ্যমে প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে মেয়েদের শিল্প শিক্ষাও দেওয়া হত (বন্দোপাধ্যায় ৫৪)।

সরলা দেবীর অনুপস্থিতিতে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বাংলায় তাঁর ভাবধারা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিদেশী দ্রব্য বয়কটের ফলে স্বদেশী জিনিসের ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এ সময়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবেশ করে স্বদেশীয়ানা। শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাজ-পোষাক সবকিছুর মধ্যে প্রকাশিত হয় স্বদেশের ঐতিহ্য যা স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি করে। স্বাদেশিকতাবোধ উত্তীর্ণ হয় জাতীয়তাবোধে যা পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তৃত ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে সহায়ক হয়। সরলা দেবী সম্পাদিত *ভারতী* পত্রিকা মেয়েদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে। তার সার্থকতা দেখি যখন মেয়েরা ঘর থেকে বের হয়ে দলে দলে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লতিকা ঘোষ, উর্মিলা দেবী, সরোজিনী নাইডু, ননীবালা দেবী প্রমুখ। এ সময় শ্রমিক ও মেথর আন্দোলনেও নেতৃত্ব

দিতে মেয়েরা এগিয়ে আসে (দেব ১০৩)। সরলা দেবী ১৯৩৫ সালে কর্মময় জীবন থেকে অবসর নিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হন। ১৯৪৫ সালের ৮ আগস্ট তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

উপসংহার

বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রথম নারী সরলা দেবীর ছিল অসীম সাহস এবং নেতৃত্বদানের সহজাত ক্ষমতা। বিয়ের পরে স্বামীর সাথে তিনি বাংলার বাইরে চলে গেলেও স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা তথা ভারতের নারীদের অংশগ্রহণের যে নবদিগন্ত খুলে দিয়েছেন, তার দরজা কখনো বন্ধ হয়নি। পরবর্তী গণ-সংগ্রামগুলিতে আরও বেশি বেশি করে নারীরা অংশ নিয়েছিল, নেতৃত্বের বিভিন্ন সারিতেও তারা উঠে এসেছিল। এ নারী জাগরণের পথপ্রদর্শকের সম্মান ও স্বীকৃতি সরলা দেবীরই প্রাপ্য। বিশেষ করে তাঁর স্বদেশী প্রচেষ্টা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগে থেকেই শুরু হয় এবং বঙ্গভঙ্গপূর্ব সময়ে বাংলার তরুণ সমাজের মধ্যে জাতীয়তাবোধের চেতনা বিকাশে এবং তাদের স্বদেশহিতের ব্রত গ্রহণে সরলা দেবী একক নারী হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এ নারীর সমগ্র জীবন বিচিত্র কর্মযজ্ঞে পরিপূর্ণ। তাঁর সংগ্রামী জীবন এ যুগের নারীকে দেশ ও সমাজসেবা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শেখাবে।

---

[১] *ভারতী* (প্রকাশকাল ১৮৯৫) হচ্ছে ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব পত্রিকা। এর পরিমণ্ডল ও পরিবেশ ছিলো সম্পূর্ণভাবে ঠাকুরবাড়ি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এই পত্রিকাটি ছিলো বাঙালির কল্পনা ও চিন্তার ধারক। *ভারতী*তে বহু যশস্বী সাহিত্যিকের স্বাদেশিক ভাবনায় সমৃদ্ধ রচনা বের হতো। রাজনীতি, স্বদেশী আন্দোলন, বিপ্লবীদের তৎপরতা, কবিতা, গান, কাব্যগ্রন্থ, রাজনৈতিক প্রতিবেদন পত্রিকাটিতে স্থান পেতো। বঙ্গভঙ্গের প্রবল আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০৫ সালের চৈত্র সংখ্যা প্রকাশ করার পর পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এরপর সরলা দেবী পত্রিকাটির দায়িত্ব নেন এবং দীর্ঘ নয় বছর দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। [সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, বসুধারা প্রকাশনী, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৬৭, পৃ. ৯৫]

[২] বিশ শতকের প্রারম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আখড়া সমিতি মাথা তুলতে থাকে। লাঠি খেলা, শরীর চর্চা, ব্যায়াম প্রভৃতি উপকরণ এই সমিতির কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলাদেশে এই সমিতিগুলো পরিচালনার নেতৃত্বে ছিলেন ব্যারিস্টার প্রমথ নাথ মিত্র, সরলা দেবীর হাতে। তাঁদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি যে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা সমরের পথ বহুলাংশে প্রস্তুত করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। [হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭), পৃ. ১১৮]

[৩] ১৮৯৫ সালে মহারাষ্ট্রের লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক রায়গড়ে শিবাজীর স্মৃতিসৌধের শোচনীয় অবস্থাকে উপলক্ষ্য কওে শিবাজী উৎসব চালু করেন। শিবাজীর বীরত্ব, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও দেশপ্রেমকে উপজীব্য করে মহারাষ্ট্র তথা দেশবাসীর মধ্যে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশে এই উৎসব চালু করা হয়। ছত্রপতি শিবাজী মোগলের দাসত্বমুক্ত যে স্বাধীন ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারই আদর্শ জাতির সামনে তুলে ধরার জন্য এই উৎসব করা হয়।

[4] যশোরের মহারাজা প্রতাপাদিত্য বাংলার বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে অন্যতম। সরলা দেবী বীরযোদ্ধা প্রতাপাদিত্যের নামে একটি মঞ্চ তৈরি করেন। এখানে একটি তরবারি রেখে ঐ তরবারিতে প্রতাপাদিত্যকে স্মরণ করে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হতো। এভাবে দেশীয়দের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হতো।

তথ্যসূত্র

অভিজিত সেন। অনিন্দিতা ভাদুড়ী সংকলিত, *সরলা দেবীর নির্বাচিত প্রবন্ধ*, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪।
কমলা দাশগুপ্ত। *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি নারী*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৮।
কমল চৌধুরী (সম্পাদক)। *বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ*, দে'জ পাবলিশিং, ২০২১।
কল্যাণী বন্দোপাধ্যায়, *রাজনীতি ও নারীশক্তি: ক্ষমতায়নের নব দিগন্ত*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৯।
গোলাম মুরশিদ। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর, ২০১২।
চিত্রা দেব। *ঠাকুর বাড়ির অন্দর মহল*, আনন্দ, ২০০৩।
জলধর সেন। *জাতীয় উচ্ছ্বাস*, সঙ্গীত সংখ্যা, ১৯০৬।
মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক। *তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, ইউ পি এল, ২০০১।
মীনা চট্টোপাধ্যায়, *স্বর্ণকুমারী দেবী*। অনুভব, ২০০০।
রেজিনা বেগম। *রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী (১৯০৫-১৯৪৭)*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০১৬।
সরলা দেবী। *জীবনের ঝরাপাতা*, রূপা অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮২।
সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়। *অগ্নিযুগের বাংলায় বিপ্লবীমানস*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। *নথিপত্রে স্বদেশী আন্দোলন*, মিত্রম, ২০১১।
সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, বসুধারা প্রকাশনী, আষাঢ় ১৩৬৭।
হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়। *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ*, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭।
আরিফা সুলতানা। "বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালি নারী", অধ্যাপক ইসহাক ফান্ড বক্তৃতা, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি*, ২০১৬।
গৌতম বসু। "বাঙলার শরীরচর্চা আন্দোলন ও ১৯১১-র ঐতিহাসিক শিল্ড জয়", আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ২০১৫।
চিত্তব্রত পালিত। "স্বদেশী সংগীত ও সমাজ", সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), *ইতিহাস অনুসন্ধান ২৪*, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১০।
তপতী সেনগুপ্ত। "সরলা দেবী চৌধুরানীর জীবন আখ্যানে তাঁর স্বাধীনতার চেতনা", পারভীন জলী (সম্পাদক), *বাংলার অবিস্মরণীয় নারী*, অবসর, ২০২৪।
মোছা. রূপালি খাতুন। "স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে বাঙালি নারী", *জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস*, ভলিউম-১০, ২০২০।
দেবলীনা ভট্টাচার্য্য। "স্বদেশী সঙ্গীত ও ঠাকুর পরিবারের প্রভাব", সৌরভ বর্মণ (সম্পাদক), *এবং প্রান্তিক*, বর্ষ ১০, সংখ্যা ২২, অনন্যা, ২০২৩।
সুচরিত ঘোষ সেনগুপ্ত। "সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদে মেয়েরা (১৯০৭-১৯৩২)", মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাস অনুসন্ধান ২৯*, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৫।
শুভশ্রী পাত্র। "বহুমুখী প্রতিভার আলোকে সরলাদেবী চৌধুরাণী", আশিস রায় (সম্পাদক), *এবং প্রান্তিক*, বর্ষ ৪, সংখ্যা ১২ অনন্যা, ২০১৭।
Bharati Roy. *Early Feminist of Colonial India*, Oxford University Press, 2002.
Amiya Samanta (ed., compiled). *Terrorism in Bengal*, A Collection of Documents, Vol-2, Goverment of West Bengal, 1995
Bharati Roy. "Swadeshi Movement and Women's Awakening in Bengal 1903-1910", *Calcutta Historical Journal*, Vol. 10, 1985.
Kanak Mukherjee. *Women's Emancipation Movement in India,* National Book Center, New Delhi, 1989
Sushila Nayyar. *Women Pioneer in Indian Renaissance,* NBT, 2002.